উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে দেশ ও জাতীয়তাবোধের ধারণা

অবিনাশ সেনগুপ্ত

সারসংক্ষেপ : *উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে দেশে জাতীয়তাবাদীর চিন্তাভাবনার সূচনাকালে সমকালীন বাংলা কাব্যতে দেশচিন্তা, জাতিবোধ, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধাচারণের কথা উঠে আসে। এই চিন্তাভাবনায় প্রশ্রয় পায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারণা, যা পরবর্তীকালে এক ও অভিন্ন ভারতবর্ষীয় জাতি গঠনের ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জাতীয়তাবাদের বিপরীতে স্বাতন্□্যবোধের প্রকাশ ঘটে। সাহিত্যে মুসলমান শাসন সম্পর্কে বিরুপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। বাংলা কবিতায় দেশ ভাবনা, দেশের সমস্যার কথা ভাবা হয়েছিল। সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি ছিল তেমনি আত্ম নির্ভরতার অভাবের জন্য হীনমন্যতাও প্রকাশ পেত।*

মূল শব্দগুচ্ছ : *বাংলা কাব্য, উনিশ শতক, জাতীয়তা, মুসলমান বিদ্বেষ, হিন্দু জাতীয়তাবোধ, কবিতায় জাতি বোধ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দু মুসলমান, বাংলা সাহিত্য, দেশ, ইংরেজ।*

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে গড়ে উঠেছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। দেশকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে একটি জাতি গড়ে তোলার ইচ্ছা ঐ সময় পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় থেকেই বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দেশ চেতনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। জাতিবোধ, জাতীয়তার ধারণাগুলি গড়ে উঠতে থাকে বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। এবং জাতীয়তাবাদী ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে ঐ সময়কার বাংলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস ও অন্যান্য রচনাগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়টির সঙ্গে বেনেডিক্ট অ্যাণ্ডারসনের কাল্পনিক সম্প্রদায়ের ধারণাটিকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। Benedict Anderson তার বিখ্যাত বই 'Imagined Communities' তে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল একটা কাল্পনিক জাতি হিসাবে

এবং মূদ্রিত ধনতন্ে□র প্রাতিষ্ঠানিক রূপের মাধ্যমে। অ্যাণ্ডারসন যুক্তি দিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদ ও কাল্পনিক সম্প্রদায় সৃষ্টির অন্যতম কারণ রাজতন্ে□র পতন এবং মুদ্রণ ধনতন্ে□র ছায়ায় ছাপাখানার উদ্ভব এবং 'স্ি□ প□ ল্যাঙ্গুয়েজ' এর প্রচলন কমে যাওয়া। জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকে অ্যাণ্ডারসন মুদ্রিত পুস্তকের বৃদ্ধি এবং মুদ্রণের প্রযুক্তিগত উন্নয়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তিনি বলেন নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশিত বই, পত্রিকা ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে পাঠকদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়। এবং তাদের মধ্যে একটা সাধারণ মতের উদ্ভব হয়। অ্যাণ্ডারসন দেখিয়েছেন যে প্রথম ইউরোপীয় জাতি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তাদের জাতীয় মূদ্রিত ভাষাকে কেন্দ্র করে।[১] Jurgen Habermas মনে করেন জনপরিসর গঠনের ক্ষেত্রে প্রেসের একটা ভূমিকা আছে। অর্থাৎ জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশনাগুলি একটি সচেতন ভাষা গোষ্ঠীর নির্মান করে এবং একই ভাষাভাষিরা ক্রমশ নিজেদের মধ্যে মতের আদান প্রদানের মাধ্যমে একটা সাধারণ মতে গিয়ে পৌঁছায়।[২] পার্থ চ্যাটার্জি দেখিয়েছেন যে, আধুনিক জাতীয়তাবাদের মতাদর্শটা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রকে পুনর্গঠন করেছিল। সেটা নতুন ধারণা ও আদর্শকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নমনীয় ও সমৃদ্ধ হয়েছিল।[৩] অনিন্দিতা ঘোষ উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় জাতীয় পরিচয় গঠনের ক্ষেত্রে মুদ্রিত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবকে দেখিয়েছেন।[৪]

আমরা এই প্রবন্ধে দেখাবো যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাংলা কাব্য-কবিতায় দেশ চেতনা, জাতিবোধের ধারণাটা কি রকম ছিল, যেগুলি রচনা করেছেন শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিরা। ভারতের জাতি গঠনের ক্ষেত্রে দেখা গেল হিন্দুত্বের আধিক্য। সমকালীন শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রাচীন আর্য গৌরবের মহিমা কীর্তনে ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে যুক্তিবাদী, প্রগতিপূর্ণ ধারণার প্রচার হয়েছিল। বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম পুরোধা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্□তির সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা চর্চার পুনরুদ্ধার, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্□তিকে বিবেচনা মত গ্রহণ, এবং মুসলমান সংস্□তি ও আচার ব্যবহারের সঙ্গে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ও ডিরোজিও ক্রমশ সেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, "হিন্দু সমাজের উদারতা, মানবতা ও সংস্□ার আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের পুনরুভ্যুত্থান আন্দোলনে পরিণত হল। 'হিন্দু প্রীতিহ ক্রমে 'হিন্দুত্বহ প্রীতির ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হল। রামমোহন–ইয়ংবেঙ্গল–বিদ্যাসাগরের উদার ও যুক্তিবাদের যুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেল। যুক্তির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, সংস্□ারের বদলে এল কুসংস্□ার, উদারতার বদলে সংকীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা।"[৫]

ঈশ্বরগুপ্তের যুগেই বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম প্রবেশ করে। এই সময়কার কাব্যের সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা ছিল না। লক্ষ্য ছিল জাতীয়তার আদর্শ প্রচার। ঈশ্বর গুপ্ত সমাজ, দেশের সমস্যা এবং কবিতাকে একটি ধারায় বেঁধে দেন। তার কবিতায় সমাজের সমস্যা বা দোষ ত্রুটি বেশি করে চোখে পড়ে হয়তো, কিন্তু তার মধ্যেই ছিল জাতীয়তার ধারণা, দেশ ভাবনা। এসব সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্তের রচনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান জাতি সম্পর্কে বিদ্বেষ প্রকাশ। তার কাছে জাতীয়তাবোধ হল হিন্দু জাতীয়তাবোধ। ঈশ্বর গুপ্ত মুসলমানদের সম্পর্কে হয় ˘যবনহ না হলে ˘নেড়েহ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন, "মর্জি তেড়া কাজে ভেড়া / নেড়া মাথা যত / নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মতো"[৬] ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে স্বদেশপ্রেম থাকলেও ইংরেজ প্রেমও ছিল অত্যন্ত প্রবল। "রাজদ্রোহিতা কারে বলে স্বপ্নে জানিনে / কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি তোমার জয়ের বাসনা" (মহারানি ভিক্টোরিয়ার জয়গান) বার্মা ও শিখ যুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ত ইংরেজদের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন।[৭] ঈশ্বরগুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহের যুগে মানুষের চিন্তাভাবনার মধ্যে যে অদুরদর্শিতা ছিল তা থেকে মুক্ত ছিলেন না।

একদিকে তিনি তার কবিতায় দেশপ্রেম, দেশের প্রতি ভালবাসার কথা বলেছেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসকের জয় কামনা করেছেন। এই মানসিকতা পর্যবেক্ষণের দ্বারা উনিশ শতকের কবিদের মানসিকতা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। এছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত সরাসরি ইংরেজ পক্ষ নিতেন। "হও মূল অনুকুল, শ্বেতকুল পক্ষে"। ঈশ্বরগুপ্ত মুসলমান বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজের জয়গান করেছেন। এধরনের চিন্তা মুসলমান সমাজের স্বাতন্□বোধকে ত্বরান্বিত করেছে পরবর্তীকালে। তার কবিতায় তিনি হিন্দুত্বের জয়গান ও মুসলমান শাসনকালের প্রতি কিভাবে বিরাগ ভাজন করেছেন তা দেখা যায় একটি অংশে, যেমন, "যবনের যত বংশ / একেবারে হবে □বংস / সাজিআছে কোম্পানীর সেনা" ১৮৫৭ সালের ২০শে জুন ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে লেখেন, "যবনাধিকারে আমরা ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইনাই, সর্বদাই অত্যাচার ঘটানো হইত.. . হে বাঙালী মহাশয়েরা .... আপনারা সকলে একান্ত চিত্তে কেবল রাজ পুরুষের (ইংরেজের) মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন করুন। ... ঐ দুস্□ য়া কারকগণ গভর্ণমেন্□র প্রধান শত্রু, তন্মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক।"[৮] তিনি হিন্দু ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই মুসলমান শাসন থেকে হিন্দুদের উদ্ধার পাবার বিষয়টিকেই তিনি দেশ প্রেম ও জাতীয়তার আদর্শ দৃষ্টান্ত রূপে দেখেছিলেন।

ইংরেজ সম্পর্কে তার শ্রদ্ধার শেষ ছিল না। তবে কখনও কখনও অত্যাচারী ইংরেজদের প্রতি তিনি বিরাগ প্রকাশ করতে কুন□া দেখাননি। তার স্বদেশ প্রেমকে অনেকেই ব্যক্তিগত দেশপ্রেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তার চিন্তাভাবনার সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজের কোনো যোগাযোগ ছিল না। রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন তার কবিতায় দেশপ্রেম থাকলেও

ভাবের গভীরতা ছিল না।[৯]

ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কবিতায় দেশ চেতনা ও স্বদেশ প্রেম মুখ্য বিষয়রূপে স্থান লাভ করে। রঙ্গলালের ধারণাতেও মুসলমান বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু যুব শ্রেণিকে অতীত হিন্দু গৌরব ও আর্যত্বের অহংকার সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। রঙ্গলাল হিন্দু বীরদের কৃতিত্বের প্রচার করতে চেয়ে মুসলমান শাসকদের হীন চোখে দেখেছেন। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'এ আলাউদ্দিনকে কেন্দ্র করে বিদেশ থেকে আগত মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ এবং স্বাধীনতার কামনা, পরাধীনতার বেদনা, দেশের প্রতি ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে।[১০] রঙ্গলালের, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে / কে বাঁচিতে চায় / দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে / কে পরিবে পায়।" এই মানসিকতায় আচ্ছন্ন কবি মুসলমানদের পরাজিত করে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষা করতে চান। এই পদ্মিনী উপাখ্যানে তিনি অত্যাচারী মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ইংরেজদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। স্বাধীনতা ও দেশ চেতনার প্রসার, গভীরতা এবং ইংরেজদের প্রশংসা করাটা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।[১১] রঙ্গলাল, "আলাউদ্দিনকে উপলক্ষ্য করে এককালের শাসক মুসলমানদের সম্পর্কে তার অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করেছেন। অন্তরে জাগ্রত অস্পষ্ট স্বাধীনতার কামনা রাজপুত বীর মহিমাকে কেন্দ্র করে অঙ্কুরিত হতে চেয়েছে। দুর্বল কবি প্রতিভা, চতুর কলাকৌশলে পারদর্শী নয়, তাই স্থুল ইংরেজ তোষণ ও মুসলিম বিদ্বেষ এত সরল ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে।"[১২]

রঙ্গলালের অন্যান্য কাব্যেও রাজপুত পাঠান বিরোধের কথা আছে। এবং তার বক্তব্য যে মুসলমানরাই ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে এবং দেশের অর্থনীতিকে □বংস করেছে।[১৩] হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রঙ্গলাল বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, রাজপুত ও বাঙালি একই জাতি। তাদের সভ্যতা ও নৈতিক আদর্শও এক। এই এক জাতি অর্থ হিন্দু জাতি, এবং বাঙালি অর্থাৎ হিন্দু বাঙালি।[১৪]

এই সময়কার ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মনে পরাধীনতার যন্□ণা ও ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ জমা থাকলেও ঔপনিবেশিক শাসনের বিকল্প সম্পর্কে এদের কোনো ধারণা ছিল না। ঈশ্বরগুপ্ত পরাধীনতার যন্□ণা বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার মহিমা সম্বন্ধে তার নীরবতাও লক্ষ্য করা যায়।[১৫] হিন্দুত্বে আবিষ্ট হিন্দু বাঙালীরা ইংরেজ শাসনকে সাগ্রহে মেনে নিয়েছিলেন এবং এই মেনে নেওয়াটারই ফলশ্রুতি ছিল ঐ ধরণের একপেশে কাব্য রচনার মূল কারণ। তবে যে সময়ে দেশ চেতনাই অনুপস্থিত সেই পরিবেশে ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলাল স্বাধীনতার কথা, স্বদেশের মাহাত্ম্য, মাতৃভাষার মহিমা ও দেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটিয়েছিলেন।

মাইকেল মধুসুদন দত্তের কাব্যে আমরা ক্লাসিকতার কৃত্রিম অনুবৃত্তি দেখি। এবং পৌরানিক কাহিনী সমুহের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুল্যায়ণে দেশ চেতনা ও বোধের গভীরতা প্রকাশ হতে দেখি। তার 'মেঘনাধ বধ' কাব্যে মহত্ব, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬] বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যথার্থ বার্তাবহ মাইকেলের মেঘনাধ বধ কাব্যে শিক্ষিত বাঙালির পরাধীনতার যন্□ণা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। "উনিশ শতকী রেনেসাঁসের প্রতীক হিসাবেই তাকে ধরা হয়ে থাকে, পাশ্চাত্বের সঙ্গে প্রাচ্য ভূমির যে সংযোগ হল এবং যে সংযোগের বিদ্যুৎ স্পর্শ ছড়িয়ে পড়ল প্রধানত সাহিত্যে, মধুসুদন তারই নকিব।"[১৭] মধুসূদনের রচনাতেও দেখা যায় অতীত হিন্দু ধর্মের কাহিনী বা চিত্র যা এ যুগের কবিদের কবিতা বা সঙ্গীত রচনার মূল প্রেরণা ছিল। তবে মধুসূদনের স্বদেশ প্রেম তার সৃষ্ট সাহিত্যের মতোই অভিনব, অচিন্তিত ও অনন্য।[১৮] এবং উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দেশ চেতনার সঙ্গে মধুসূদনের দেশ ভাবনার পার্থক্য ছিল। তিনি পাশচাত্য দেশপ্রেমের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। রসিংকা চৌধুরী দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং সেগুলিই গ্রহণ করেছেন যেগুলি তাদের দৃষ্টিতে ভাল এবং শ্রেষ্ঠ। তারা বদল এবং মিশ্রণও ঘটিয়েছিলেন।[১৯]

মধুসুদন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্ত্তী সময়ে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও নবীন চন্দ্র সেন, দুজনেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এবং এই কবিতার যুগ হেম-নবীনের যুগ বলে খ্যাত হয়েছিল।[২০] হেমচন্দ্রের কাব্যেও দেশ ভাবনা এসেছে। তবে মধুসুদনের মতো হেমচন্দ্রের দেশ ধারণার মধ্যে অভিনবত্ব ছিল না। এবং অনেকাংশে ঈশ্বরগুপ্তকে অনুসরণ করেছিলেন। তার ছোটো ছোটো কবিতায় দেশ সম্পর্কে আন্তরিকতার পরিচয় ছিল। কিন্তু সেগুলি দেখলে সেই হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও মুসলমান সমাজের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। "বিংশতি কোটি মানবের বাস / এ ভারত ভূমি যবনের দাস। / রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা"[২১] 'বীরবাহু' কাব্য কাল্পনিক ইতিহাসের পটে আঁকা দেশপ্রেমের কাব্য।[২২] এখানেও মুসলমানদের প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। "মাগো ও মা জন্মভূমি / আরো কতকাল তুমি / এবয়সে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে / পাষান যবন দল বল আর কতকাল / নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।"[২৩]

স্বদেশ ভাবনার উদ্রেক ঘটাতে এবং দেশপ্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার করতে গিয়ে হেমচন্দ্র মুসলমান শাসনকালকে আক্রমণের লক্ষ্য করেছিলেন। তবে হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ', 'ভারতভিক্ষা', 'ভারতসঙ্গীত', 'রিপন উৎসব', 'ভারতের নিদ্রা ভঙ্গ' ইত্যাদি রচনাগুলি ঐ সময়কার জনমানসে দেশ ভাবনা জাগ্রত করতে সার্থক হয়েছিল। তবে হেমচন্দ্রের মধ্যে ইংরেজ শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত কবিতাবলীর অন্তর্গত 'তুষানল' কবিতায় দেখা যায় যে, ইংরেজ ভারতের কোনো উপকার করে নি এটা

বোঝার পরেও হেমচন্দ্র ইংরেজের মাহাত্ম্য স্বীকার না করে পারেন নি।[২৪]

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে দেশ চেতনা, জাতীয়তার ধারণাগুলি গড়ে ওঠার যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ কারণ ছিল। রেনেসাঁসের প্রাণ পুরুষদের চারিত্রিক শক্তির মধ্যে যে দেশভাবনা ও দেশপ্রেম বিকাশ লাভ করেছিল সেটাই সমস্ত জনপরিসরে ও জাতির জীবনে প্রবেশ করেছিল। তাই দেশের ভাবনা, দেশকে ভালবাসা, পরাধীনতা থেকে মুক্তির চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তাভাবনা আমল পেত না। এবং সেই মানসিকতাটাই কাব্য তথা সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল। তবে সেই দেশ চেতনার মধ্যে শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মের কথাই বলা হয়। জাতীয়তার ধারণা হিন্দুত্বের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়। এই চিন্তাভাবনা ছিল একপেশে এবং অন্য সব ধর্মের প্রতি বিরুপতার নিদর্শন। যা ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য বিশারদরা হয় অনুভব করতে পারেন নি বা অনুভবের চেষ্টা করেন নি। ঐতিহাসিক কবিতায় স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে মুসলমান রাজাদের দেখানোটা বাঙালি মুসলমানের মধ্যে পরিচয় সংকট তৈরি করেছিল।[২৫] পার্থ চ্যাটার্জি লিখেছেন, "জাতীয়তার যে ইতিহাস গত শতাব্দী থেকে লেখা হয়ে এসেছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে রয়েছে এমন সব কাহিনী, ধারণা, ব্যাখ্যা যা আজকের উগ্র হিন্দু প্রচারের প্রধান উপাদান। সত্যি বলতে কি, বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখলে একটা সাংঘাতিক সত্য বেরিয়ে আসবে। সেটা হল যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই প্রতিচ্ছবি, আয়নায় মুখ দেখার মত – তার রূপ, আকৃতি, গড়ন, অবিকল এক।"[২৬]

তবে ঐ সময়কার আরেক জন কবি নবীন চন্দ্র সেনের রচনার মধ্যেও স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রকাশ পেয়েছিল। তবে নবীন চন্দ্রের ভাবনার মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তার পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত তুলনায় বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন কাব্য। নবীনচন্দ্র কিন্তু দীর্ঘ দিন বসবাসকারী এদেশের মুসলমানদের বিতাড়িত করার কথা ভাবেন নি। মুসলমানরা আলাদা জাতি হলেও দীর্ঘ দিন ধরে যে সামাজিক ঐক্যবদ্ধতা গড়ে উঠেছিল তাকে নবীনচন্দ্র স্বীকার করেছেন। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে মুসলমান শাসনকালকে এক করে দেখেন নি। যেমন, "জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত / ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।/ যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত / সার্ধপঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল/ একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদুরিত / জেতাজিত বিষভাব, আর্যসূত সনে / হইয়াছে পরিণয়, প্রণয় স্থাপিত, / নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি ধর্মের কারণে"[২৭] শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর দেশপ্রেম ও দেশভাবনা নবীনচন্দ্রের কাব্যে সরাসরি প্রকাশ পায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তার ধারণাটির গঠন লক্ষ্য করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, কাব্যের মাধ্যমে জন পরিসরে দেশ সম্পর্কে বোধ বা জাতি সম্পর্কে বোধ তৈরির চেষ্টা চলেছিল। সাহিত্য এবং জাতীয়তার ধারণা দুটি এই সময়ে পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল।[২৮]

কিন্তু এই বোধ তৈরির পশ্চাদে কাজ করেছিল যেহিন্দু পুনরুত্থানবাদী চেতনা তা পরবর্তীকালে মুসলমানদের জাতীয় রাজনীতি থেকে আলাদা করে ফেলে। রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৬ সালে হিন্দু সমাজকেই তাদের কাজের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের দ্বেষভাব স্পৃহনীয় নয় বলে মন্তব্য করলেও প্রাচীন হিন্দু গৌরবের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলমান শাসকদের প্রতি তিনি বারবার অপমান সূচক শব্দ ব্যবহার করেন। ১৮৭০ থেকে হিন্দুরা যে ইতিহাস চর্চার সূচনা করে সেখানে প্রাচীন হিন্দু যুগকে গৌরবের যুগ বলে পরিচিতি দেওয়া হয়। অপরদিকে মুসলমান শাসনকে অধঃপতনের যুগ হিসাবে ঘৃণা করা হল।[২৯] বঙ্কিম প্রধান সাধনা হিসাবে যে জাতীয় সংস্□তিকে গ্রহণ করেছিলেন তা আসলে ছিল হিন্দু সংস্□তি। যতই বিতর্ক হোক, বঙ্কিমের লেখা থেকে অহিন্দুরা ভাববেনই যে জাতীয় সংস্□তিতে অহিন্দু ভারতীয়ের স্থান নগন্য।[৩০] অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী মনে করেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি তার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, চূড়ান্ত বিরূপ মনোভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না।[৩১] তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার বাইরে এদেশের ঐতিহ্যের মধ্যে যে কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য বর্তমান সেটা মনে করিয়ে বঙ্কিম জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করেছিলেন। ভারতীয় আদর্শ সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করেছিলেন।

বহুকাব্যে স্থানীয় হিন্দু রাজাদের জাতীয় বীর হিসাবে দেখানো হয়েছে কারণ তারা মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। কিন্তু আসলে দেখা যায় এরা নিজের স্বার্থেই মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এবং এরা প্রজাদের কম শোষণ করতেন না। এছাড়া ঐ সব হিন্দু রাজারা কেউই সর্ব ভারতীয় নেতা নন। ইতিহাসের পছন্দ মতো ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে যে সাহিত্য এই সময় সৃষ্টি হয়েছে[৩২] সেখানে জাতিধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তার ধারণা গড়ে না তুলে অযথা মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরুপ মনোভাব প্রকাশ করে জাতি গঠনের ধারণাকে দুর্বল করা হয়েছে। এবং বহু অনৈতিহাসিক ধারণা মানুষের মনে প্রবেশ করেছে। রসিংকা চৌধুরি যুক্তি দিয়েছেন যে, মুসলমানদের বিদেশী হিসাবে দেখানোটা জাতি গঠনে সমস্যা তৈরি করেছিল এবং যা ছিল হিন্দু চিন্তাভাবনা।[৩৩] সাম্প্রতিক কালে গুজরাট দাঙ্গা বা উগ্র হিন্দু প্রচারের পেছনেও যে মানসিকতা কাজ করছে তা শুরু হয়েছিল ঐ সমস্ত ভদ্রলোকদের রচনায়। বা বলা যায় জাতীয়তাবাদী রচনার ভেতর তার জন্ম থেকেই এই উপকরণগুলি সঞ্চিত হয়ে এসেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রচিত কবিতায় হিন্দুত্বের স্পর্শ অনেক হালকা হয়ে যায়। এই সময় কবিরা হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত ভাবে জাতি গঠনের ডাক দেন। শিক্ষিত বাঙালি অনুভব করেন যে ইংরেজ শাসকের ষড়যন্□ নস্যাৎ করতে হলে মুসলমানদের কাছে টানা জরুরী। কারণ দীর্ঘ বঞ্চনার পর মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সরকার। স্বভাবতই মুসলমানদের বোঝানো হতে লাগলো যে, মুসলমানরাও এদেশবাসী এবং হিন্দু ও

মুসলমান ভাই ভাই। কারণ শিক্ষিত হিন্দু বুঝেছিল যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল করতে হলে ইংরেজ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ হিন্দু মুসলমান সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে দেশ ব্যাপী সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরী। আসলে পরিস্থিতি অনেক বদলে গিয়েছিল বিশ শতকের শুরুতে। উনিশ শতকীয় চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উনিশ শতকে অতীত গৌরবের জন্য আপশোস করেছেন, তিনিও বিশ শতকের প্রথমে তার গানে কবিতায় নাটকে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু মুসলমান শক্তির উপর জোর দিয়েছেন।

উনিশ শতকে বেশির ভাগই সাংস্□তিক স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ হত। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনে কোনো আপত্তি থাকবে না যদি না তারা দেশের ঐতিহ্য মর্যাদা ও ভাষাগত সংহতিকে নষ্ট না করে।[৩৪] তাদের চিন্তার প্রতিফলনে ইংরেজ অধীনতার বাস্তব ছবিটি লক্ষ্য করা যায়। তাদের ঔপনিবেশিক বিরোধী মানসিকতা বা সচেতনতা সব সময়ে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। পার্থ চ্যাটার্জি দেখিয়েছেন, বুদ্ধিজীবীদের একটা সম্পূর্ণ আলাদা সাংস্□তির জীবন বা ক্ষেত্র ছিল, যেখানে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না। বা ইংরেজ যাকে ছুঁতে পারেনি।[৩৫] ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও দেশের সমাজের মধ্যে যে অর্থপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল সেখান থেকেই সাংস্□তিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল এবং এটি রাষ্ট্র ও উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিল।[৩৬]

এই সময় বহু কাব্যে দেশের দরিদ্র জনগণের অভাব দুর্দশার জন্য বিদেশী শাসকদের দায়ী করা হত। ইংরেজ শাসন থেকে তারা যন্□ণা পেতেন। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রতিদন্দ্বিতা করা তাদের সাহসে কুলাতো না। এই ঔপনিবেশিক শাসনের যন্□ণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা ব্যাঙ্গ বিদ্রুপের আশ্রয় নিতেন। চেষ্টা হত ব্যাঙ্গ কবিতার মাধ্যমে ইংরেজ সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও আসল চরিত্রটা তুলে ধরতে। এছাড়া রাজভক্ত দেশবাসীর প্রতিও বিদ্রুপ করা হত যারা ইংরেজ তোষামোদে ব্যস্ত থাকতেন। এই সময় বাংলায় আন্দোলন মুখী যে রাজনৈতিক ধারণার উদ্রেক হয় সেখানে কৃত্রিম আস্ফালন, রাজনৈতিক অনুকরণ, ভোটকে কেন্দ্র করে গোলমাল, কর্পোরেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় নিয়েও ব্যাঙ্গ কবিতা রচনা করা হত। এছাড়া যারা প্রকাশ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধাচারণ করেন তারাই আবার ভেতরে ভেতরে ব্রিটিশ তোষণ করেন। তাদের বিরুদ্ধে উক্তি, "পরের অধীন দাসের জাতি 'নেশন' আবার তারা। / তাদের আবার 'এজিটেশন' নরুন উঁচু করা।"[৩৭]

বাংলা সাহিত্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বাঙালির অন্তঃসার শূন্য রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের যে রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি ছিল তাকে ব্যাঙ্গ করে মাইকেলের মতোই 'ভারত উদ্ধার' নামে একটি ব্যাঙ্গ কাব্য রচনা করেছিলেন।[৩৮] বাঙালির অলস প্রকৃতি, দূর্বলতা ও মুখে মেরে দেবার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

সাহিত্যে প্রায়ই অভিযোগ উঠতো। তবে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে না নিলেও পরিস্থিতির প্রতিবাদ তারা করতে পারেন নি। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী কবিদের মনে হয়েছিল এই সমালোচনা ও বিদ্রুপ তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় সত্য। তাই এই সময়ের সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যেমন ছিল তেমনি ছিল আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা।

উনিশ শতকের কাব্যে বা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে জাতিবোধ গঠনের ক্ষেত্রে বড় ত্রুটি ছিল হিন্দুত্বের জয়গান। এই অভিজ্ঞতা এবং একপেশে মনোভাবের কারণ বিশ শতকের প্রথমে হিন্দু মুসলমান সর্বধর্ম সমন্বয়ী ঐক্যের আহ্বান বাস্তবায়িত হতে চায় নি। এই সময় মুসলমান চিন্তাবিদদের লেখা পত্র পড়লে বোঝা যায় যে, উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালির লেখা কাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যে যেভাবে মুসলমানকে আক্রমণ করা হয়েছে তা সমস্ত মুসলমান সমাজে বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। একে মুসলমানরা পশ্চাদপদ ছিলেন, নানা ভাবে বঞ্চিত ছিলেন, অন্যদিকে হিন্দু বুদ্ধিজীবী দ্বারা ক্রমাগত বিদ্বেষ পূর্ণ আক্রমণ এবং মুসলমানদের দূরে সরিয়ে ইংরেজকে ত্রাতা হিসাবে গ্রহণ, ফলে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। জয়া চ্যাটার্জি হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণিকে এজন্য দায়ী করেছেন। এরা ধর্ম ও দেবদেবীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা সঞ্চারের কাজে লাগান। জয়া চ্যাটার্জি দেশ ভাগের জন্য মুসলমান সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নয় বরং বিশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দু ভদ্রলোক গোষ্ঠীর যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল তাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।[৩৯] আমাদের ধারণা আরও আগে উনিশ শতকের সাহিত্যেও এর অনুপ্রেরণা ছিল। টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থটি রাজপুতানার কাল্পনিক কাহিনীতে সমৃদ্ধ এবং যাকে অনুসরণ করে ক্রমাগত মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে রোষ বর্ষণ করা হয়েছে। এবং পাশ্চাত্য থেকে নেওয়া ধ্যান ধারণাকে ভিত্তি করে হিন্দু অতীতের ধারণা তাদের রচনায় প্রভাব ফেলেছে। এবং এই ধারণাই হিন্দু কাল, মুসলমান কাল এই দুই কাঠামোয় বিভক্ত করে দিয়েছিল। যার প্রভাব প্রবল ভাবে পড়েছিল ১৯৪৭ এর আগে আগে।[৪০] কোনো কোনো কাব্যে এমন ধারণাও করা হয়েছিল যে, ঔপনিবেশিক শোষক হলেন মুসলমানরা, ব্রিটিশরা নয়।

উনিশ শতকের কাব্যে স্বাধীনতার কথা এলেও দ্বিধা কুন□া সাহসের অভাব ছিল। এই সময়ে বাঙালির রাজনীতির ইতিহাসের দুর্বলতাকে তার কারণ বলা যেতে পারে। সামন্ততান্ি□ক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা সাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কখনও বা একটু প্রতিবাদ করলেও পরবর্তীসময়েই আবার এমন নীরবতা পালন করেছেন যে ব্রিটিশ শাসনকে খুশি মনে গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধার উদ্রেক হয়নি।[৪১] মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী,

জাতীয়বাদী হিন্দুদের প্রতিরোধ কাহিনী সত্য ও কল্পনার মিশ্রণে উত্তেজিত ভাবে প্রচার করা হলেও আদর্শবাদী সর্বধর্ম সমন্বয়কারী ঐক্যের আহ্বান সেদিন বাস্তবায়িত করা হয় নি।[৪২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রচিত কাব্যে যেটা লক্ষণীয় সেটা হল রচয়িতাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে একটা আপাত বৈপরীত্য, দ্বিধা সঙ্কুল মানসিকতা, দেশের জন্য ব্যাকুলতা, আত্মনির্ভর না হতে পারার জন্য হতাশা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি ক্ষোভ, অন্যদিকে একই ভাবে মুসলমান শাসনকালকে দুর্ভোগের কাল হিসাবে চিহ্নিত করা এবং এই সমস্ত কিছু থেকে মুক্তির জন্য লেখা লেখির মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির প্রচেষ্টা। কিন্তু চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে একযোগে সমস্ত ধর্মের মানুষকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে ধরণের মনোভাবের প্রয়োজন ছিল সেটা হয়নি বলেই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটি আলাদা জাতি সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে দেশভাগ নিশ্চিত হল। তবে এই স্বাদেশিকতাবোধ প্রথম থেকেই সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি হয়েছে, আঞ্চলিকতা সেভাবে প্রশ্রয় পায় নি।

সূত্র নির্দেশ :

১. Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1983.

২. Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere:An Inquiry to a Category of Bourgeois Society, MIT Press, U.S.A., 1989.

৩. Partha Chatterjee, Nation and Its Fragments, Colonial and Post Colonial Histories, Princeton University Press, New Jersey, 1993.

৪. Anindita Ghosh, Power in Print, : Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, OUP, 2006.

৫. বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৭।

৬. নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ১৭১।

৭. ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাদেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪৫।

৮. উদ্ধৃতি, তাজুল ইসলাম হাশমী, ঔপনিবেশিক বাংলা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৫।

৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৪২৭।

১০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭–১৯২০),বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৮।
১১. ভবতোষ দত্ত, বাঙালীর সাহিত্য, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৭৬।
১২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ২০০৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।
১৩. লায়েক আলি খান, বাংলা সাহিত্যে ও মুসলমান সমাজ ও চরিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৮০।
১৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ২০০৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।
১৫. অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২০।
১৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১৯৮১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০।
১৭. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬৭।
১৮. অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯।
১৯. Rosinka Chaudhury, Gentlemen Poets in Colonial Bengal; Emergent Nationalism and the Orientalist Project, Seagull, 2002.
২০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১৯৮১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩।
২১. নজরুল ইসলাম, ১৪০১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।
২২. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪।
২৩. নজরুল ইসলাম, ১৪০১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।
২৪. অনুরাধা রায়, কবিদের স্বদেশী আন্দোলন, ব্রজশিখায় বাংলা, গণশক্তি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫০।
২৫. Aveek Majumdar, 'Poetry and Nationalism' (ed.) Sayantan Das, in South Asian Nationalism Reader, World View Publication, 2007, p. 532.
২৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ, ২০০৬, পৃ. ১৩১।
২৭. নবীন চন্দ্র সেন, পলাশীর যুদ্ধ, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), ওরিয়েন□, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ২৪।
২৮. Pradip Kr. Dutta, 'Bangla Sahitya and the Vicissitudes of Bengali Identity in the Latter Half of the Nineteenth Century', in Mastering Western Texts, Sambuddha Sen (ed), Permanent Black, 2003.

২৯. সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, 'বিশ শতকের বাঙালি সমাজ : হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক', স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্□তি, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৪৬।
৩০. পঞ্চানন সাহা, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, নতুন ভাবনা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা , বাংলা দেশ, ফেব্রয়ারী, ২০০১, পৃ. ১২৪।
৩১. তপন রায়চৌধুরী, ইউরোপ পুনর্দর্শন, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৬।
৩২. গৌতম নিয়োগী, 'সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস', গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ইতিহাস চর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা, সেতু, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১১ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪।
৩৩. Rosinka Chaudhury, 2002, পূর্বোক্ত।
৩৪. অনুরাধা রায়, ২০০৫, পূর্বোক্ত।
৩৫. Partha Chatterjee, 1993, পূর্বোক্ত।
৩৬. Partha Chatterjee, 'Post Colonial Civil and Political Society' in Kaviraj and Khiluani (ed) Civil Society : History & Possibilities,Cambridge University Press, 2002.
৩৭. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮।
৩৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮।
৩৯. Joya Chatterjee, Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947, Cambridge University Press, 1995.
৪০. Rosinka Chaudhury, 2002, পূর্বোক্ত।
৪১. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রীম, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৬।
৪২. আজহারউদ্দিন খান, ১৯৯৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭।